অভিবাসী হলো গড়ানো পাথর

ডঃ আবুল হাসনাৎ মিল্টন

প্রবাসে বাঙালিদের দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্ধ এক অনিবার্য বাস্তবতা। আমেরিকা, ইংল্যা□, ইটালি, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে থেকেও তার তেমন কোন ব্যত্যয় নেই। এনিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে হতাশাও কম নয়। আমরা যারা টুকটাক লেখালেখি করি তাদের জন্য বিষয় হিসেবেও এটি বেশ আকর্ষণীয়। কোন কোন কলাম লেখকের আবার এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ অন্যান্যদের চেয়ে কয়েকধাপ বেশী। তাদের লেখা পড়লে মনে হয় প্রবাসে সব ছেড়ে বাঙালিরা শুধু দলাদলি আর হাউকাউই করে। এবং এতে তাদের বুকটা খানখান হয়ে ভেঙে যায় প্রায়শই।

আসলে অন্যের সমালোচনা বা পরচর্চা করা খুব সহজ একটা ব্যাপার, বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বেশ প্রিয়ও বটে। কিন্তু আমরা একবারো এহেন গোষ্ঠীদ্বন্ধ বা কোন্দলের স্বরূপ উদঘাটন করে এটি নিয়ন্ত্রনে তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা বা সুপারিশ রাখতে পারিনা। এটিরও কারন আছে। লেখালেখি সবার দ্বারা সমানভাবে হয়না এটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি হলো লেখালেখি করলেও সব লেখকের বিশ্লেষণী ক্ষমতা সমান হয়না। তাছাড়া নিয়মিত লেখালেখি করতে হলে প্রতিনিয়ত যে পরিমান পড়াশুনা করা প্রয়োজন, প্রবাসে তাই বা করে কয়জনে? এটিতো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপারও, কীইবা দরকার এতটা কষ্ট করবার? সেদিক দিয়ে অনেক সহজ হলো কিছুদিন পরপর প্রবাসী বাঙালিদের ভুল-ত্রুটি নিয়ে লেখালেখি করা, আর অযাচিতভাবে উপদেশ বর্ষণ করা। অথচ ওই লেখকেরা বোধহয় আয়নায় নিজেদের মুখ খুব একটা দেখার সময় পাননা। প্রবাসীদের যেসব ত্রুটি নিয়ে তারা কলম ধরেন তার অনেক দোষে তারা নিজেরাই আপাদমস্তক দোষী। নিজের বেলায় সে ত্রুটি সংশোধনের তেমন কোন উদ্যোগতো চোখে পড়েনা। বরং লেখক হয়েও কারো কারো হীনমন্যতা, চিন্তার দীনতা দেখে আমি খুব কষ্ট পাই। আমার মৌলিক বিশ্বাসের পালে আশংকার দোলা লাগে। আমার ধারনা ছিল যারা লেখালেখি করে তারা মানুষ হিসেবে অন্যরকম। তাদের অধিকাংশই প্রাত্যাহিক, খুঁটিনাটি দীনতার উর্দ্ধে। খ□কালিন প্রবাসে এসে আমার সে ধারনা বদলে গেছে দ্রুত।

পেশাগত কারনে আমার বসবাস মানুষের অসুখ-বিসুখের সাথে। এখন আর প্রত্যক্ষভাবে রোগী না দেখলেও শিক্ষকতার পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা নিয়েও ব্যস্ত থাকি। এর বাইরে যে সামান্য সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে সেসময়ে খবরের কাগজ ও বইপড়া এবং লেখালেখি নিয়েই কাটাই। লেখালেখির কারনেই সংশ্লিষ্ট অনেক ভাবনা মাথায় আসে, আমি ভাবি, নিজের সামান্য জ্ঞানে বিশ্লেষণে মাতি।

যদিও আমি রাজনীতি বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের গবেষক নই, তবু সেসব বিষয়ও বিশ্লেষণী ভাবনায় উঠে আসে মাঝে মধ্যে। কেন প্রবাসে এসেও বাঙালি বদলায় না? কেন সে দলাদলি-কোন্দল-গোষ্ঠীদ্বন্ধে মাতে? এতকিছু থাকতেও কেন তার বৈঠকখানার আড্ডার অধিকাংশই জুড়ে থাকে গীবত-পরনিন্দার মত নিন্দনীয় ব্যাপার?

এসব সমস্যার সাথে দেশান্তরী হওয়ার কি কোন সম্পর্ক আছে? মানুষ নানা কারণে দেশান্তরী হয়: কেউ উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে, কেউ রাজনৈতিক কারণে কেউবা ভাগ্যপরিবর্তনের আশায়। দেশান্তরী হয়ে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বেছে নেয় অভিবাসী জীবন। এই অভিবাসী জীবন তার ফেলে আসা জীবনের থেকে ভিন্ন, এ জীবন বড় বহুমাত্রিক। এ জীবনে শুরু হয় নিত্যনতুন নানামুখী দ্বন্ধ - ফেলে আসা জীবনের সাথে বর্তমান জীবনের। নতুন দেশের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সুখ-দুঃখের বহিপ্রকাশের ধরন আলাদা, সর্বোপরি জীবন-যাপনের ধারায় রয়েছে ব্যাপক ভিন্নতা। এতসব ভিন্নতার সাথে মানিয়ে নেওয়া যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। বিশেষ করে যারা প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী, জীবনের নানা পর্যায়ে যারা দেশান্তরী হয়ে অভিবাসী হয়েছেন তাদের জন্য।

অভিবাসী জীবনের সীমাবদ্ধতা ও বেদনা অনেক। তার পুরোটুকু অতিক্রম করে প্রথম প্রজন্মে নতুন দেশের মানুষ ও সমাজের সাথে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া বোধহয় প্রায় অসম্ভবই। অনেকেই শারীরিকভাবে অভিবাসী হলেও মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে যান। মন তার পড়ে থাকে ফেলে আসা স্বদেশের আঙিনায়। তবু অর্থনৈতিক বাস্তবতায়, সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে কিংবা জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার আর ফেরা হয়না শেকড়ের কাছে। সময়ের চাকায় বাধা পড়ে সে গড়িয়ে চলতে থাকে। অভিবাসী হলো গড়ানো পাথর, তার গায়ে তাই শ্যাওলা জমেনা।

এই অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটে অভিবাসী দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রজন্মে এসে। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী অভিভাবকের চিন্তাভাবনা আর তার বেড়ে ওঠা দেশটার সমাজ-সংস্কৃতির দ্বন্ধে দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসীকে মুখোমুখি হতে হয় আরেক টানাপোড়েনের। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ প্রজন্মে এসে অভিবাসীরা অনেকখানি এদেশীয় হয়ে ওঠে, দাদা-দাদীর দেশ তখন রূপকথার গল্পের মত কিংবা ফেলে আসা একটুকরো মধুর স্মৃতি হয়ে যায়। তারা এগিয়ে চলে মূলধারায়। কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় অভিবাসী জীবনেও ধরে রাখে মূল শেকড়ের স্পর্শ, এদের সংখ্যা যদিও ক্রমশ কমতে থাকে।

প্রবাসে তাই সর্বাধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই হলো মানসিক। বাংলাদেশ বিরাজ করে এদের সার্বক্ষনিক ভাবনায়। কাজের অবসরে এদের অনেকেই তাই জড়িত হয় স্বদেশ সংশ্লিষ্ট নানারকম

সংগঠনের সাথে। তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই অনেক সংগঠনে দেখা দেয় বিভক্তি। আদর্শের বুলি আওড়ানো হলেও প্রায় ক্ষেত্রেই এই বিভক্তির মুলে থাকে ব্যক্তিত্বের সংঘাত। সপ্তাহান্তে বাঙালি পরিবারগুলো একে অন্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রনে যায়, সেখানে খাওয়ার পাশাপাশি চলে তুখোড় আড্ডা, আড্ডার প্রধান বিষয়ই হলো পরনিন্দা-গীবত। এর ব্যতিক্রমও আছে, তবে তারা সংখ্যায় অল্প।

কারো কারো মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে সংগঠনে বিভক্তি, গোষ্ঠীদ্বন্ধ, দলাদালি, কোন্দল, পরনিন্দার মত বৈশিষ্ট্যগুলি বাঙালি কোথা থেকে অর্জন করে? সেকি এসব প্রবাসে এসে শেখে? না, প্রবাসে এসে নয়, প্রবাসী হবার পথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোতো সে নিজের সাথেই বহন করে নিয়ে আসে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে। এতো কেবল প্রবাসী বাঙালিদেরই চরিত্রের বৈশিষ্ট নয়, এতো বাঙালিরই চরিত্রের অংশবিশেষ। অভিবাসী হলেই তো তার সারা জীবনের আচার-আচরন-বৈশিষ্ট্য এত দ্রুত বদলে যাবেনা। মানুষের আচরন বদলানো কখনো কখনো কুকুরের লেজ সোজা করার চেয়েও কঠিন।

আমি তাই প্রবাসে বাঙালির এই গোষ্ঠীদ্বন্ধ, বিভক্তি, পরচর্চার অভ্যাস কোনকিছুতেই বিস্মিত কিংবা হতাশ হই না, বরং এটিইতো স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার পাশাপাশি এও বিশ্বাস করি, শুভ্রতার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একধরনের পক্ষপাত চিরকালীন। প্রবাসে এসে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীরাও এসব উন্নত দেশের ভালো ব্যাপারগুলোর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করবে, তা দেখে অনুপ্রানিত হবে এবং নিজেদের জীবনেও তা প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করবে, এটি আশা করাতো ন্যায়সঙ্গত। এভাবেই ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে প্রবাসী প্রজন্মগুলো শুভ্রতা ও সুন্দরের পথে বেড়ে উঠবে।

আমাদের তাই শুধু সমালোচনা করলেই চলবেনা, অভিবাসী জীবনের সীমাবদ্ধতার আলোকে বিষয়গুলো বিবেচনা করে এর উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। একটি কথাতো অনস্বীকার্য, প্রবাসীরা শুধু কোন্দল আর পরচর্চায়ই মেতে থাকেনা। নিজের জীবনের অসংখ্য টানাপেড়েন ও সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তারা খুবই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছেন। প্রবাসে বাঙালিরা কতজনে কতরকম কষ্টের কাজই না করেন। তবু দিনের শেষে, মাসের শেষে এত কষ্টের মধ্য দিয়ে অর্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর মুহূর্তে তাদের মুখে যে হাসি ফুটে উঠে, তার কাছে ম্লান হয়ে যায় সকল দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা। আর প্রেরিত সেই অর্থে শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য যা খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

স্বদেশে বা প্রবাসে বসে শুধু প্রবাসী বাঙালিদের সমালোচনাই নয়, স্বদেশের প্রতি তাদের এই আনুগত্য, ভালবাসা ও অবদানের কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। তাদের এই

ভূমিকার কথা স্বীকার করা উচিত বারবার, প্রতিনিয়ত প্রশংসাও করা উচিত যা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।